৩7

দৈনিক বাংলা

তারিখ 12 APR 1992
পৃষ্ঠা 8 কলাম ৩

বয়স্ক সাক্ষরতা ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশে নৈশস্কুল, কম্যুনিটি এডুকেশন, বয়স্কশিক্ষা বা গণশিক্ষার প্রায় ১০৪ বছরের (১৮৮৭–১৯৯১) ইতিহাস ও কার্যক্রমের তেমন কোনো তথ্য, পরিসংখ্যান ও উপাত্ত সুসংবদ্ধভাবে গ্রন্থিত নয়। এ ক্ষেত্রে যেসব মূল্যবান বই–পত্র, প্রতিবেদন বা দলিল–দস্তাবেজ পাওয়া যায় তার অধিকাংশ অসমাপ্ত ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

বয়স্ক শিক্ষা বা গণশিক্ষা কর্মসূচী শতাব্দীকাল ধরে একনাগাড়ে সমন্বিতভাবে ধারবাহিকতা রক্ষা করে চলেনি বলে এই কর্মসূচীর যোগ–সূত্রতা খুঁজে পাওয়া দুরুহ কাজ–বর্তমানে অসম্ভব।

বিগত ষাট, সত্তর ও আশি এই তিনটি দশকেও (যার ইতিহাস রাখা সম্ভব ছিল) এই কর্মসূচী বারে বারে বাধা পেয়ে, বন্ধ হয়ে এবং ধারাবাহিক যোগসূত্র হারিয়ে চলে আসছিল বলে এবং এই কর্মসূচীর নামের বিরক্তিকর পরিবর্তনের ফলে, অফিস স্থানান্তরের কারণে এবং কিছু শাখা, ইউনিট বা ইনস্টিটিউট চিরতরে ধ্বংস করে দেয়ার ফলে এই কর্মসূচীর অতীত ও বর্তমান পরিস্থিতির চিত্র একসঙ্গে পাওয়া দুঃসাধ্য। তবে যে ক্ষীণ যোগসূত্র পাওয়া যায় তা এরকম ঃ

১। অবিভক্ত বঙ্গদেশে (বেংগল প্রভিন্স) নৈশ স্কুলের ধারনা পাই–১৮৮৭ সালে হানটার কমিশনের রিপোর্ট থেকে। ২। গণসাক্ষরতা কর্মসূচী চালু (আসাম, সিলেট ও বাংলাদেশে) ১৯৩৭। ৩। ভিলেজ এইড কর্মসূচীর আওতায় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী চালু (পূর্ব পাকিস্তান আমলে)। ৪। পূর্ব পাকিস্তানে পরীক্ষামূলক দিশারী বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প চালু (১৯৬৩–৬৪ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত)। ৫। সরকারী উৎসাহে বেসরকারী উদ্যোগে রৌমারী থানায় বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প চালু (১৯৭১–১৯৭৪)। ৬। ৫২ থানার গণশিক্ষা কর্মসূচী চালু (১৯৭২)। ৭। দিশারী প্রকল্প সীমিতভাবে অব্যাহত (১৯৭২–১৯৮০)। ৮। সকল থানায় গণশিক্ষা কর্মসূচী চালু (১৯৭২–১৯৭৩)। ৯। দিশারী প্রকল্প, অফিস, পাঠাগার ও বয়স্ক শিক্ষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বিলুপ্তিকরণ (১৯৮০)। ১০। প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা পরিদপ্তর চালু (১৯৮০–১৯৮১)। ১১। গণশিক্ষা কর্মসূচী বন্ধ ঘোষণা (২৪ মার্চ ১৯৮২)। ১২। সীমিত গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরু (১৯৮৮–১৯৯১)। ১৩। গণসাক্ষরতার নবতর উদ্যোগ ঘোষণা (১৯৯১–৯২)।

গণশিক্ষা কার্যক্রমের উপরোক্ত দৃষ্টান্ত বা ধারাবাহিক যোগসূত্রতার উল্লেখ ছাড়াও দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ থেকে অনেক অসরকারী উন্নয়ন সংস্থা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান অবদান রেখে চলেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৭৩–৭৪ থেকে ৭৯–৮০ এই ছ' বছর এবং ১৯৮২ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত এই ছ'বছর সর্বমোট ১২ বছর বা এক যুগ ধরে বাংলাদেশে সরকারী উদ্যোগে কোন গণসাক্ষরতা কর্মসূচী ছিল না। এ দুটি সময়কাল হচ্ছে জাতীয় জীবনে অন্ধকার একযুগ। অন্য কথায়, আমাদের সাক্ষরতার ইতিহাসে কলংকজনক অধ্যায়।

সাক্ষরতার সংজ্ঞা ঃ

যুগের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে সাক্ষরতার বাস্তব সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে ১৩–১৫ই মার্চ ১৯৮৯ কুমিল্লায় বাংলাদেশ পল্লী [illegible] একাডেমীতে সরকারী উদ্যোগে [illegible] বেসরকারী সংস্থা পরিচালিত [illegible] পর্যালোচনা কর্মশিবিরে [illegible] নির্ধারণ করা [illegible] রাখার ক্ষমতা লাভ।'

অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ১। কথা শুনে বুঝতে পারা (বোঝা)। ২। লেখা পড়তে পারা (পড়া)। ৩। হিসাব করতে পারা (গণনা)। ৪। হিসাব লিখতে পারা (হিসাব)। ৫। হিসাব লিখে রাখতে পারা (সংরক্ষণ)। ৬। লিখতে পারা (লেখা)।

এই ৬টি দক্ষতা অর্জনের নামই সাক্ষরতা। সাক্ষরতা মানে অক্ষর জ্ঞানের সক্ষমতা। আর সাক্ষর (স+অক্ষর) মানে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি।

সাক্ষরতার অন্যান্য সংজ্ঞাগুলো বাংলাদেশে নিম্নরূপ। ইউনেস্কো ঃ বোঝবার জ্ঞানসহ যিনি তাঁর দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীর সম্পর্কে একটি সহজ বিবরণী পড়তে ও লিখতে পারবেন। ১৯৮১ ঃ যে কোনো ভাষায় একখানা চিঠি লেখা। ১৯৭৪ ঃ যে কোনো ভাষা পড়ায় ও লেখায় সক্ষমতা। ১৯৬১ ঃ যে কোনো ভাষায় বোঝবার জ্ঞানসহ দৈনন্দিন জীবনের একটি ছোট বিবরণী পড়ার ও লেখার সক্ষমতা। ১৯৫১ ঃ যে কোনো ভাষায় পরিষ্কারভাবে ছাপানো লেখা পড়তেপারা।

উপরোক্ত ৬টি সংজ্ঞা থেকেও কোনো দেশের বিশেষত বাংলাদেশের সাক্ষর জনগণের শিক্ষার মান নির্ণয় করা যায় এবং সাক্ষরতার পরিস্থিতির অনুধাবন করা সম্ভব।

জনসংখ্যা ঃ

আমাদের দেশে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে, এখন থেকে ৯০ বছর আগে জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৯০ লাখ। বর্তমানে (১৯৯১ খৃষ্টাব্দের জনগণনা অনুসারে) জনসংখ্যা ১০ কোটি ৮০ লাখ। অর্থাৎ বিগত ৯০ বছরে আমাদের জনসংখ্যা ৫/৬ গুণ বেড়েছে। একই সঙ্গে বেড়েছে সাক্ষর ও নিরক্ষরের সংখ্যা।

সাক্ষরতার হার ঃ

আমাদের সাক্ষরতার হার ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ৫৬% ছিল। বর্তমানে ১৯৯১ খৃষ্টাব্দে এই হার ২৪ দশমিক ৮ বলে বলা হয়েছে। আর ১০ বছর আগে এই হার ছিল ২৩ দশমিক ৮%। অর্থাৎ বিগত ১০ বছরে সাক্ষরতার হার বেড়েছে এক শতাংশ মাত্র। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, বিগত ৮২ বৎসরে সাক্ষরতার হার ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের হারের চাইতে ৪ গুণ বেড়েছে। এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতির চাইতে সাক্ষরতার হারের গতি যে শ্লথ তা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মানহচ্ছে।

এক্ষেত্রে মতব্য, শিক্ষাবিদ ফেরদাউস খান একবার লিখিতভাবে বলেছিলেন, আমাদের সাক্ষরতার হার যে গতিতে বাড়ছে তাতে সমগ্র জাতিকে সাক্ষর করতে ৪৬৬ বছর লেগে যেতে পারে।

আর এখন বলা যায়, আমাদের ৭৫ দশমিক ২% শতাংশ নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর করতে ৭৫০ বছরেরও বেশী সময় লেগে যাবে। কারণ গত ১০ বছরে সাক্ষরতার হার বেড়েছে মাত্র এক শতাংশ (সর্বনাশ) ইতিমধ্যে ৭৫০ বছরে যে বিশাল নিরক্ষরের সংখ্যা বাড়বে, তাদের সাক্ষর করতে আরো কত বছর লাগবে তার হিসেব এখানো করা হয়নি। সুতরাং 'দিল্লী হনুজ দূর অস্ত' –দিল্লী এখনো অনেক দূরে!

সাম্প্রতিক সাক্ষরতা কার্যক্রম ঃ

সম্প্রতি, প্রায় ৬ বছর পর, সরকারী উদ্যোগে ও বেসরকারী অংশগ্রহণে কিছু সাক্ষরতা কর্মসূচী পরিচালিত হয়। কিছু কিছু কর্মসূচীর কার্যক্রম উল্লেখ করা হলো ঃ

১৯৮৭–৮৮ ঃ বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপনের প্রাক্কালে আনুষ্ঠানিকভাবে গণশিক্ষা কার্যক্রমের [illegible] ঘোষণা করেছে। এই কার্যক্রমের [illegible] কর্তৃপক্ষ এবং [illegible] সংস্থার মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। প্রথমোক্ত কর্তৃপক্ষ ১৯৮৮'র ফেব্রুয়ারিতে প্রথম কার্যক্রম শুরু করে এবং প্রথমবারে ১৪টি উপজেলা কর্তৃপক্ষকে সরাসরি অনুদান দেয়। এই ১৪টি উপজেলা কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকে ৬০টি করে মোট ৮৪০টি কেন্দ্র পরিচালনা এবং এতে ভর্তিকৃত পড়ুয়ার সংখ্যা ৩৩,৬০০ বলে জানান। তবে সফল পড়ুয়ার সংখ্যা জানা যায়নি। মোট বরাদ্দকৃত বা ব্যয়িত অর্থের পরিমাণও জানা সম্ভব হয়নি।

১৯৮৮–৮৯ ঃ পরিবর্তীতে আরও ১৩টি উপজেলা কর্তৃপক্ষকে গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুদান দেয়া হয়। এই অনুদানের টাকার পরিমাণ, কেন্দ্র সংখ্যা, শিক্ষকের সংখ্যা, ভর্তিকৃত পড়ুয়ার সংখ্যা ও সফল পড়ুয়ার সংখ্যা ইত্যাদি কিছুই জানা যায়নি।

১৯৮৮ ঃ এ বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ছ'টি এনজিওকে ইউনিসেফের অনুদান দেয়া হয়। এর আওতায় ১৪০৬টি কেন্দ্র চালু করা হয়। এতে নিয়োজিত শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা ১৪১৭, সুপারভাইজারের সংখ্যা ৭৪ এবং ভর্তিকৃত পড়ুয়ার সংখ্যা ৩৪৯৪৮ বলে ধরাহয়েছে।

এই কর্মসূচী চলাকালীন মূল্যায়ন হলেও এর কোনো বার্ষিক ফলাফলের রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। তবে মূল্যায়নের মাধ্যমে মোট খরচ, পড়ুয়ার মাথাপিছু খরচ, কোর্সের মেয়াদ, সফল পড়ুয়ার সংখ্যা ইত্যাদি জানা সম্ভব।

একই বছর আরো ৯টি এনজিওকেও অনুদান প্রদান করা হয়েছিল। এদের উদ্যোগে ৩৫১টি কেন্দ্রে ভর্তিকৃত পড়ুয়ার সংখ্যা ৩১,২৭৭। কিন্তু এই কর্মসূচীর

আবুল কাসেম সন্দ্বীপ

বার্ষিক রিপোর্ট, শিক্ষাকালের মেয়াদ, সফল পড়ুয়ার সংখ্যা, প্রশিক্ষণ, মাথাপিছু খরচ ও ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি জানাযায়নি।

জুন, ১৯৮৯ ঃ ১৯৮৯–এর জুন মাসে সরকার গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার জন্য ২০টি বেসরকারী সংস্থাকে সরকারী অনুদানদেয়।

১৯৮৯–৯০ ঃ উপরোক্ত অর্থবছরে সরকার ইউ এন ডি পি–র সহযোগিতায় প্রাপ্ত তহবিল থেকে ৯টি সংস্থাকে গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক অনুদান দেয়। এই কর্মসূচী শেষ হবার দীর্ঘদিন পরে এর মূল্যায়ন হয়। তাতে ভর্তিকৃত পড়ুয়ার সংখ্যা ৮৩,৪৪৫ বলে জানা গেছে। তবে সকল সংস্থার গঠিত কেন্দ্রসংখ্যা জানা যায়নি। মূল্যায়ন রিপোর্টে ৬টিকে অনুদান দিতে এবং ৩টি সংস্থাকে অনুদান না দিতে সুপারিশ করা হয়েছে (সং–৪)।

গণশিক্ষা সংঘ কার্যক্রম ঃ

এই সংস্থার পরিচালনায় 'স্থানীয় ক্ষুদ্র সংস্থার মাধ্যমে গণশিক্ষা কার্যক্রম' শীর্ষক এক কর্মসূচীর আওতায় ৪৩টি উপজেলায় ৪৮টি সংস্থার মাধ্যমে গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে ৫০ হাজার নিরক্ষরকে সাক্ষর করার লক্ষ্য স্থির করা হয়। এই কার্যক্রম ইউ, ডি, পি'র সহযোগিতায় বিদেশী সাহায্য সংস্থার আর্থিক অনুদানে পরিচালিত হয়। বর্তমানে এই সংস্থা বিলুপ্ত প্রায়।

এম, ই পি ঃ ১০৯ সদস্য বিশিষ্ট এই সংঘই পরিচালিত এই কর্মসূচীর আওতায় ১ লাখ ১৬ হাজার টাকা ব্যয়ে ৫১টি এনজিও'র ৮৯ জন গণশিক্ষা প্রমোটারকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এর মধ্যে ৭৭ জন পুরুষ ও ১২ জন মহিলা। সংঘে পরিচালিত গণশিক্ষা কর্মসূচী সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যাদি জানা সম্ভব। এই সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলাদেশ গণশিক্ষা সংঘ' শীর্ষক পত্রিকাখানা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ সকল সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত গণসাক্ষরতা প্রকল্পসমূহের সাফল্য–ব্যর্থতার বিবরণী, মূল্যায়ন রিপোর্ট ও বার্ষিক কার্যবিবরণীর অভাব, অপ্রতুলতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ সাধারণ সাক্ষরতা কর্মীদের দ্বারে পৌঁছায়নি। ফলে, এসবের প্রকৃত উদ্দেশ্যও ফলপ্রসূ হয়নি।

সাক্ষরতার ক্ষেত্রে অভাব ঃ

বাংলাদেশে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে আমাদের অনেক অভাব–অনেক কিছুই আমাদের 'নাই'। এই 'নাই'–এর তালিকায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হতে পারে ঃ ১। জাতীয় চেতনা, ২। রাজনৈতিক অঙ্গীকার, ৩। রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত, ৪। সরকারী পদক্ষেপ, ৫। সাচিবিক উদ্যোগ, ৬। দাপ্তরিক নির্দেশ, ৭। গণ–চাহিদা ও ৮। গণ–উপযোগিতা ইত্যাদি।

কিন্তু এইসব 'নাই'–এর মধ্যেও আমাদের দেশ ও জাতি, রাষ্ট্র ও সরকার, সাক্ষর ও নিরক্ষর এবং সর্বোপরি শিক্ষক ও পড়ুয়া রয়েছে। 'সাক্ষরতা' সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে কাজ করার মতো বহু উৎস, সম্পদ, সুযোগ ও শক্তি আছে আমাদের। দেশে বর্তমানে ৮২ লাখের বেশী শিক্ষিত লোক আছে যারা সাক্ষরতা কর্মসূচীতে শিক্ষক–শিক্ষিকা হিসাবে কাজ করতে ও সময় দিতে সক্ষম।

সাক্ষরতা কর্মী ঃ বাংলাদেশে সাক্ষরতা কর্মী হিসাবে কাজ করতে পারবেন এমন শিক্ষিত লোকের সংখ্যা সম্পর্কে নিচে একটি তালিকা দেয়া হলো–

	ধরন	সংখ্যা (লাখ)
১।	৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়া ১৫ বছরের বেশী বয়সী শিক্ষিত তরুণেরসংখ্যা	৪১১
২।	৯ম শ্রেণী বা তদূর্ধ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর সংখ্যা	১৩৮
৩।	শিক্ষক–শিক্ষিকার সংখ্যা	২৮
৪।	শিক্ষিত সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা	৫৫
৫।	অন্যান্য শিক্ষিত লোকের সংখ্যা	১৯০
৬।	সর্বমোট (১৯৯০–এর ৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)	৮২২

শিক্ষক উপকরণ ঃ

আমাদের দেশে বিগত এক শতাব্দী কালে, বিশষতঃ ১৯৩৭ থেকে ৫৫ বছর ধরে সাক্ষরতা কর্মসূচী পরিচালনার জন্য পাঠ্যসূচী, পাঠক্রম, পাঠ্যবাই, অনুসরণী বই, চার্ট ও পোষ্টারসহ প্রিন্ট মিডিয়ায় অসংখ্য উপকরণ প্রস্তুত হয়েছে। বর্তমানে ইলেকট্রোনিকস মিডিয়ায়ও প্রচুর শিক্ষণ উপকরণ তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে বহু পরীক্ষামূলক কর্মসূচী পরিচালনার ফলে পদ্ধতি ও কর্মকৌশল নিয়ে বহু অনুসন্ধান ও গবেষণা হয়েছে। ফলে, বর্তমানে যাচাই–বাছাই করে একটি গণগ্রাহ্য পদ্ধতি ও কর্মসূচী নির্ধারণ করা পূর্বাপেক্ষা অনেক সহজতর হবে।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে বর্তমানে ২০টিরও বেশী সংস্থা ৫টির বেশী পদ্ধতি ব্যবহার করে সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনাকরছে।

এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে আফ্রো–ল্যাটিন আমেরিকান দেশসমূহের বিপুল অভিজ্ঞতাসমূহের অনুধ্যান।

সুতরাং, আর অপেক্ষা নয়। এখনই নিরক্ষরতার মতো পশুত্ব নিধনে আত্মনিয়োগ করা দরকার।